ধর্মনিরপেক্ষতাঃ স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা (শেষ পর্ব)

ধর্মনিরপেক্ষতাঃ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট; হাজার বছর ধরে এই বাংলায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিদ্যমান ছিল, শুধুমাত্র ব্রিটিশ আমলের শেষ দশক ব্যাতীত। বাংলার মানুষ, ধর্মপ্রান, কিন্তু ধর্মান্ধ বা ধর্মহীন নয়, এই হচ্ছে আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতার সারাংশ।

পাকিস্তান আমলঃ ধর্মের ভিত্তিতে সৃষ্টি (পৃথিবীতে মাত্র দুইটি দেশ, অন্যটি ইসরায়েল!) এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্য দিয়ে, সদ্য প্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানে, সরাসরি ধর্মনিরপেক্ষতার দাবি করা সম্ভব না হলেও, পরোক্ষ ভাবে তা করা হচ্ছিল। আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম বাদ দেওয়ার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু এই প্রক্রিয়ার শুরু করেন। পরর্বতীতে ছাত্রলীগ'ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যাবস্থার দাবীতে আন্দোলন করে। প্রসংগত উল্লখ্য, শুরু থেকেই ধর্মনিরপেক্ষতা'র দাবি ছিল সংঘাতর্পূন!

প্রথম সংঘাতঃ ১৯৬৯ সালের (খুব সম্ভবত) ১৫ আগষ্ট; টি, এস, সি তে যখন ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যাবস্থার উপর সেমিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, তখন ততকালীন 'ইসলামী ছাত্র সংঘ'র (শিবিরের পাকি সংস্করন) পক্ষ্য থেকে সেমিনারটি বানচালের চেষ্টা করা হয়, কারন তদের মতে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যাবস্থার পরেই, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যাবস্থার দাবী উঠতে বাধ্য। তাদের সেই ধারনা যে অমূলক ছিল না, তা পরর্বতী ইতিহাসই প্রমান করে। সেইদিন সাধারন ছাত্রদের সাথে সংঘর্ষে, টি, এস, সি'র সামনে রেসর্কোস'এর গেইটে, ততকালীন 'ইসলামী ছাত্র সংঘ'এর সভাপতি আব্দুল মালেক নিহত হয়।

পাকিস্তান আমল ও অপপ্রচারঃ ২১ ফেব্রুয়ারী'তে বাঙ্গালীরা হিন্দু'দের মত (!) রাস্তায় আলপনা আঁকে!! খালি পায়ে বেদী'তে গিয়ে ফুল দেয়!!! এই হচ্ছে একুশে ফেব্রুয়ারী সম্পর্কে পাকিস্তানীদের মূল্যায়ন।

বাঙ্গালী'দের কৃষ্টি ও সাংস্কৃতি সম্পর্কে সর্ম্পূন অজ্ঞ, এবং বাঙ্গালী'দের প্রতি অন্ধ বিদ্বেষে পরির্পূন পাকিস্তানী'দের কাছ থেকে এর চেয়ে ভাল কোন কিছু আশা করাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। পাকিস্তানী'দের মতে জনাব শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ'ও আসলে হিন্দু ছিলেন, তার আসল নাম 'ত্যাজারাম'!! প্রথম জীবনে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত এবং পবিত্র কোরআন শরীফের উপর অসাধারন দখল সম্পন্ন (অনেকের মতে কোরান'এ হাফেজ), জনাব শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ সম্পর্কে এই ধরনের উদ্ভট ও বানোয়াট তথ্য, একমাত্র পাকি'দের মাথা থেকেই তৈরী হওয়া সম্ভব।

নীরদ চৌধুরী ও শর্মিলা বসুঃ ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে, পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা আই, এস,আই; লন্ডন প্রবাসী ভারতীয় বাঙ্গালী শ্রী নীরদ চৌধুরী'কে দিয়ে 'আত্মঘাতী বাঙ্গালী' নামে একটি বই প্রকাশ করায়। পাকিস্তানী অর্থে প্রকাশিত এই বইয়ের মূল উদ্দেশ্য ছিল আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধকে একটি হঠকারী প্রচেষ্টা বলে প্রতীয়মান করার (ব্যর্থ) অপপ্রয়াশ।

গত বছর যুদ্ধাপরাধী'দের বিচার প্রক্রিয়া শুরা হবার পর হটাৎ করে **শর্মিলা বসু নামক** লন্ডনবাসী **আরেক ভারতীয় বাঙ্গালী গবেষক (!) আবিস্কার করে বসলেন যে, ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনা বাহিনী নাকি গনহত্যা করে নাই! বলাই বাহূল্য যে, শর্মিলা বসু'র গবেষনার সব তথ্য সূত্র ছিল পাকিস্তানী। এই শর্মিলা বসু আর কেউ নন,** শ্রী নীরদ চৌধুরী'র আপন ভাগ্নি!!

লেঃ জেঃ নিয়াজী, মেজর সিদ্দিক সালিক, মেঃ জেঃ রাও ফরমান আলী, এদের সবার ভাষায়ই আমাদের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মহান মুক্তিযূদ্ধ, সব কিছুই সংখ্যালঘূ হিন্দুদের দ্বারা সংগঠিত, বাংলাভাষী মুসলমানরা এই সব আন্দোলনে তেমন সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল না!

প্রকৃত তথ্যঃ তদানীন্তন পূব্ব পাকিস্তানে জনসংখ্যার আনূমানিক ১৫% ছিল সংখালঘূ হিন্দু সম্প্রদায়। তাই স্বাভাবিক ভাবে যে কোন পরিসংখ্যানে তাদের ১৫% প্রতিনিধিত্ব করার কথা। পাকি'দের ভাষ্য অনুযায়ী, ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধিকার আন্দোলন' যদি হিন্দু সম্প্রদায়ের দ্বারা এবং তাদের নেতৃত্বে হয়ে থাকতো, তবে এই সব আন্দোলনে হিন্দু সম্প্রদায়ের নিহতদের সংখ্যা আনুপাতিক হারের বেশী বই কম হওয়ার কথা নয়। যেমন আমরা দেখতে পাই, ছাত্র সম্প্রদায় এই সব আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাই শহীদ'দের তালিকায় ছাত্র সম্প্রদায়ের আনুপাতিক হার, অন্য যে কোন সম্প্রদায়ের চেয়ে অনেক বেশী। নীচের উদাহরন গুলি থেকে এই ধারনাই প্রমানিত হবে।

ভাষা আন্দোলন ও হিন্দু সম্প্রদায়ঃ আমদের দেশের ৫২'র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে আমরা যদি ১৯৭১ সালের ২৫শে র্মাচ পর্যন্ত সকল শহীদের তালিকা দেখি, তাতে আমরা দেখতে পাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বরকত, সালাম, রফিক, শফিক, জব্বার থেকে শুরু করে তেজগাওয়ের শ্রমিক মনু মিয়া, নবকুমার ইন্সটিটিউশনের ছাত্র মতিউর, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসাদ, সার্জেন্ট জহুরুল হক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জোহা সহ অনেক শহীদ'দের নাম। পাকিস্তানী র্মূখদের ভাষ্য অনুযায়ী, কোন সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের একজন'কে তো আমরা এই শহীদ'দের তালিকায় খুজে পেলাম না!

শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত'ই হচ্ছেন এর একমাত্র ব্যাতিক্রম এবং সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য প্রতিনীধি, যিনি বাংলা ভাষার আন্দোলনে কার্যকরী ভূমিকা রাখেন এবং পরর্বতীতে শহীদ হন। ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম তৎকালীন বেঙ্গল প্রদেশের (র্বতমানের বাংলাদেশ) ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার রামরাইল গ্রামে। ১৯৪৭ সালের পর একজন অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিক হিসেবে পাকিস্তানের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সালের ২৫ আগস্ট পাকিস্তান গণপরিষদে তিনি অধিবেশনের সকল কার্যবিবরণী ইংরেজি ও র্উদুর পাশাপাশি বাংলাতেও রাখার দাবি উত্থাপন করেন। ১৯৭১ সালের ২৯ র্মাচ রাতে পুত্র দিলীপকুমার দত্তসহ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাঁদেরকে ময়নামতি সেনানিবাসে নিয়ে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়।

মহান মুক্তিযুদ্ধ ও হিন্দু সম্প্রদায়ঃ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে প্রায় ১ কোটি মানুষ ভারতে শরর্নাথী হিসাবে আশ্রয় নিয়েছিলেন, যার কমপক্ষে ৭০ শতাংশ ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের অর্ন্তভূক্ত, কারন হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনই ছিলেন পাকিস্তানীদের আক্রমনের মূল লক্ষ্যবস্তু এবং নির্যাতনের প্রধান শিকার। এই প্রসংগে উল্লেখ্য যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় নিহত (যুদ্ধ ব্যাতীত) বেসামরিক মানুষের সিংহভাগই হচ্ছেন সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের অর্ন্তভূক্ত।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এই ৭০ লাখ সীমান্ত অতিক্রমকারীদের মধ্যে পরর্বতীতে কয়জন ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা, তা আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা বা মুক্তিযুদ্ধের উপর লিখিত বই গুলি পড়লেই জানতে পারি। আমাদের খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৬৭৬ জন। এর মাঝে বীরশ্রেষ্ঠ ৭, বীরউত্তম ৬৮, বীরবিক্রম ১৭৫ এবং বীরপ্রতীক ৪২৬ জন। এই খেতাবপ্রাপ্ত বীরদের তালিকায় ১ শতাংশের চেয়েও কম হচ্ছে, হিন্দু সম্প্রদায়ের অর্ন্তভূক্ত!

বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন আলমগীর সাত্তার, বীর প্রতীক এর ভাষায়, "প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মাহবুব আলমের লেখা, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপক পরিসরকে নিয়ে এমন অসাধারণ বই (গেরিলা থেকে সম্মুখ যুদ্ধে) আমি আর পড়িনি। ওই বইখানা পড়লে সর্ম্পূণ মুক্তিযুদ্ধের সময়টা আমার কাছে জীবন্ত হয়ে ওঠে।"যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার মাহবুব আলমের নেতৃত্বাধীন মুক্তিযোদ্ধারা জলপাইগুড়ি শহরে, ৬০ দশকের ঢাকার বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ নন্দীর বাড়িতে দেখা করতে যান। আলাপের এক পর্যায়ে মিসেস নন্দী বিস্ময় প্রকাশ করে বলে উঠেন, " আরে এ তো দেখছি প্রায় সবাই মুসলমান, মুসলমান ছেলেরা যুদ্ধ করছে, আর তোমাদের সাথের হিন্দু বন্ধুরা কি, মাসী পিসির বাড়িতে নেমন্তন খেয়ে বেড়াচ্ছে?"

তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি, ভাষা আন্দোলন এবং আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সৃষ্ট কোন জন-বিচ্ছিন ঘটনা নয় বরং এতে অংশগ্রহনকারীদের কমপক্ষে ৯৫ শতাংশ এবং যুদ্ধে স্বেচ্ছায় আত্মত্যাগকারীদের প্রায় শতকারা ৯৮% ছিল সংখ্যাগরিষ্ট মুসলমান সম্প্রদায়ের অর্ন্তভূক্ত। এই মুসলমান সম্প্রদায় সম্প্রদায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা ধর্মপ্রান, কিন্তু ধর্মান্ধ নয়।

উপরের উদাহরন (এবং মুক্তিযূদ্ধের ইতিহাস), থেকে বার বার প্রমানিত হয় যে, বাঙ্গালীর ভাষা ও স্বাধীনতার আন্দোলন;' সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের দ্বারা সৃষ্ট বা পরিচালিত কোনটাই নয়। **পাকিস্তানী সর্মথকদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে আরো দেখানো দরকার যে,** বাঙ্গালীর ভাষা ও স্বাধীনতার আন্দোলন'এ সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের অবদান বা স্বেচ্ছায় আত্মত্যাগ এর পরিমান, তাদের জনসংখ্যার আনুপাতিক হারের চেয়ে অনেক অনেক কম!

স্বাধীন বাংলাদেশ ও র্ধমনিরপেক্ষতাঃ ৫২, ৬৯ এর আন্দোলন এবং ৫৪ এবং ৭০ এর নিব্বাচনের সময় এবং পরর্বতীতে কখনোই র্ধমনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের দাবী; এই সব আন্দোলনে বা নিব্বাচনী ইশতেহারে ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, গনতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদ'ই ছিল মুক্তিযূদ্ধের মূল চেতনা। (৭০ এর দশকে বঙ্গবন্ধু ও শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ'এর ভাষনে আমরা বার বার দেখতে পাই, "বাংলার হিন্দু, বাংলার মুসলমান, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার খৃষ্টান" সবার সমান অধিকারের এবং শোষনহীন সমাজ ব্যাবস্থা' প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছিল)। বস্তুত, **মুক্তিযুদ্ধের 'বাই-প্রোডাক্ট' হিসাবে, 'র্ধমনিরপেক্ষতা' বাস্তবে; ও 'সমাজতন্ত্র' কাগজে-কলমে, আজিত হয়েছিল।**

স্বাধীন বাংলাদেশে র্ধমনিরপেক্ষতা শুধু রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসাবে সংবিধানের পাতায়ই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং রেডিও, টি ভি এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের সব্বত্রই এই র্ধমনিরপেক্ষতার ছাপ ছিল সুস্পস্ট। আমাদের দেশই একমাত্র দেশ, যেখানে রেডিও, টি ভি'র অনুষ্ঠান শুরু হতো হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সব র্ধমের (তা জনসংখ্যার ১ শতাংশ বা তার চেয়ে কম হলেও) বানী প্রচারের মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সব র্ধমের প্রবিত্র দিনগুলি সরকারি ছুটি, যা আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ার মত র্ধমনিরপেক্ষ (!) দেশগুলিতে কল্পনাও করা যায় না।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্টের পর থেকে এই রাষ্ট্রীয় মূলনীতি'টির অবস্থান অত্যন্ত নরবড়ে হয়ে যায়। র্ধমনিরপেক্ষতা নিয়ে শুরু হয় নোংরা রাজনীতি। এমনকি ১৯৯৬ সালের নিব্বাচনের সময় বলা হয়, "অমুক দল ক্ষমতায় আসলে মসজিদে আযানের পরিবর্তে উলুধ্বনি শুনা যাবে!!!"

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ইসলাম ধর্মঃ পাকিস্তানীরা ১৯৭১ সালে ইসলাম ধর্ম রক্ষার নামে লাখ লাখ মানুষ'কে হত্যা, ধর্ষন, করেছিল, ধর্মের নামে চরম অর্ধম করেছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় সব ধর্মভিত্তিক দল (মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী ইত্যাদি) মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতা করেছিল, গনহত্যা, নারী নির্যাতন, লুঠতরাজ, অগ্নি-সংযোগ'এ সরাসরি ভূমিকা রেখেছিল; তাই বলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ কখনোই ইসলাম ধর্মের বিরূদ্ধে ছিল না, বরং প্রকৃতপক্ষে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ছিল সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে, জালিমের অত্যাচারের বিরূদ্ধে একটি ন্যায় সঙ্গত যূদ্ধ। মুসলমান নামধারী পাকিস্তানী ও তাদের এদেশীয় সহযোগী'দের সেই বব্বর আচরন, যে কোন ধর্মপ্রান মুসলমানের জন্য চরম লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়। মৌলবাদীদের দাবী অনূযায়ী, আমাদের দেশে মুসলিম (শারিয়া) আইনে বিচারের ব্যাবস্থা বহাল করা হলে অনেক আগেই, কমপক্ষে কয়েকলাখ পাকিস্তানী ও তাদের এদেশীয় দালালদের শিরচ্ছেদ হয়ে যেত।

মৌলবাদী প্রচারনা ও ইতিহাস বিস্মৃত বুদ্ধিজীবিগনঃ সম্প্রতি আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিছু সাংবাদিক এবং ইতিহাস বিস্মৃত তথাকথিত বুদ্ধিজীবিগন, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় মৌলবাদী প্রচারনায় ইন্ধন যোগাচ্ছে। তাদের লেখায় যুদ্ধাপরাধী ও পাকিস্তানী দালালদের বিচারের দাবীর সাথে পবিত্র ইসলাম ধর্ম বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান'কে জড়িয়ে ফেলছেন।

শংকর কুমার দে নামক জনকণ্ঠের এক সাংবাদিক এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল, "মাত্র একশত গজের মধ্য দুই মাদ্রাসা"। লেখার সারবস্তু ছিল, এইসব মাদ্রাসায় জংগী তৈরী হয়। আমি জানিনা শংকর কুমার দে'র মত সাংবাদিক'দের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যাবস্থা সম্পর্কে কতটুকু ধারনা আছে! তবে না জেনে, যে কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অন্য কোন ধর্মের মানুষের স্পর্শকাতর মন্তব্য না করাই দ্বায়িত্বশীল সাংবাদিকতার অংশবিশেষ বলে আমি মনে করে। শংকর কুমার দে'র মত কূপমন্ডুক সাংবাদিকদের জেনে রাখা উচিত, শুধু পুরান ঢাকা নয়, ঢাকা শহরে একশত গজের মধ্য একাধিক অনেক মসজিদ এবং মাদ্রাসা আছে। বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের রূপকার, শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ'ও প্রথম জীবনে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন।

এই ধরনের স্পর্শকাতর ও কান্ডজ্ঞানহীন প্রতিবেদ্ন, **মৌলবাদ, জামাতে ইসলামী এবং দালালদের বিরোধিতা'র সাথে ইসলাম ধর্মকে জড়িয়ে ফেলে এবং দেশের ধর্মপ্রান মানুষ এর ধর্মীয় অনুভূতিকে মারাত্মকভাবে আঘাত করে।** ২০০১ সালের নিব্বাচনের প্রাক্কালে এই ধরনের এক অতিউৎসাহী ব্যাক্তি 'কুকুরের মাথায় টুপি' সংবলিত নিব্বাচনী পোস্টার বিতরন করে, যা নিব্বাচনে মুক্তিযূদ্ধের সপক্ষের শক্তির বিপক্ষে অতন্ত্য ফলপ্রসুভাবে কাজ করেছিল।

ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে বাড়াবাড়িঃ ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি, যেমন মানুষ'কে ধর্মান্ধ করে দিতে পারে, তেমনি ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে বাড়াবাড়িও সমাজ'কে ধর্মহীন রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যাবস্থার দিকে ঠেলে দিতে পারে। বাংলাদেশের সিংঘভাগ মানুষ'ই ধর্মপ্রান; ধর্মান্ধ বা ধর্মহীন নয়, তা সে মুসলমান, হিন্দু, খৃষ্টান বা বৌদ্ধ ধর্মালম্বী'ই হউক না কেন।

ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে বাড়াবাড়ি, অটোমান সম্রাজ্যের পতনের পর, কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে তুরস্ক খেলাফত ও আরবী প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত করার ব্যাপক প্রক্রিয়া শুরু করে। আরবী হরফের পরিবর্তে রোমান হরফে তুর্কী ভাষা লেখা, নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়; যার সবই ছিল তুরস্ক'কে আধুনিকায়নের অংশবিশেষ।

খেলাফত বা আরবী প্রভাব উচ্ছেদ ও আধুনিকায়নের সাথে সাথে, কামাল পাশা ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ইসলাম ধর্মের বিরূদ্ধে জেহাদে নেমে পড়েন। তুরস্কে আইন করে দাড়ি রাখা ও হিজাব পড়া'কে নিষিদ্ধ করা হয়। প্রায় ১০০ বছর পর, আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি তুরস্কে ইসলামপন্থী দল ক্ষমতায় এসেছ! আজ কামাল পাশা'র ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদের চেতনা শুধু মাত্র সামরিক বাহিনী (ন্যাটোর অর্ন্তভূক্ত) ও বয়স্ক'দের মধ্যেই মূলত সীমাবদ্ধ। কোন বাড়াবাড়ির ফলই শুভ হয় না।

দেশে এখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চলছে, তাই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লেখনীদের খুবই সাবধান থাকতে হবে যেন, তাদের লেখায় কোনভাবেই যেন ইসলাম ধর্মকে; জামাত বা পাকিস্তানীদের যুদ্ধাপরাধের সাথে জড়িয়ে না ফেলেন। যুদ্ধাপরাধীরা যেন সাধারন মানুষকে বিভ্রান্ত করতে, 'পবিত্র ধর্ম'কে তাদের ঢাল হিসাবে ব্যাবহার করতে না পারে সেইদিকে সবারই লক্ষ্য রাখা উচিত।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ভারত-বাংলাদেশ সর্ম্পকঃ ১৯৭১ সালে ভারত, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে বড় বন্ধু ছিল। গত ৪১ বছরে ভারতে ও বাংলাদেশের আভ্যন্তরীন ও আর্ন্তজাতিক নীতি'র বিশাল পরিবর্তন হয়েছে। এই ভারত সরকার, ১৯৭১ সালের বন্ধুভাবাপন্ন ভারত সরকার নয়, এমনকি শেখ হাসিনার সরকারের প্রতিও বন্ধুভাবাপন্ন নয়! ১৯৭১ সালে, সীমান্তে কাটাতারের বেড়া, বি, এস, এফ এর নির্যাতন, অবরূদ্ধ ছিটমহল, ফারাক্কা বা তিস্তার পানি; এই সমস্যাগুলির জন্ম'ও হয় নাই। তখন শুধুমাত্র ফারাক্কা বাধ র্নিমানের কাজ চলছিল। **তাই ভারতীয় নীতি বা ভারত সরকারের অবন্ধুসূলভ আচরনের সমালোচনা করা'কে যারা 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'র বিরোধী বা মৌলবাদী আচরন' বলে রঙ চড়ানোর চেষ্টা করে থাকেন, তাদের থেকে সাবধান থাকা প্রয়োজন।**

গঙ্গা আমার মা, পদ্মা আমার সৎমাঃ এই হচ্ছে ভূপেন হাজারিকা'র গাওয়া সেই বিখ্যাত গানটির বাস্তব অবস্থা। প্রতি পদে পদে আমাদের সাথে, আমাদের ভারতীয় বাঙ্গালী ভাইরা বিমাতা সূলভ আচরন করে চলেছেন অনেক বছর ধরে। আমাদের দেশের কিছু মেরুদন্ডহীন বুদ্ধিজীবি (ঢাকায় অনেকের ভাষায়, ভারতীয় হাইকমিশনে ফ্রি মদ খাওয়ার জন্য যাদের গলা সব সময় শুকিয়ে থাকে) দুই বাংলা'র একাত্মার কথা বলতে বলতে গলা শুকিয়ে ফেলেন। তাদের কাছে আমার জিজ্ঞাসা, সীমান্তে কাটাতারের বেড়া, বি, এস, এফ এর নির্যাতন, অবরুদ্ধ ছিটমহল, ফারাক্কা বা তিস্তার পানি; আমাদের বাঁচা মড়ার এই সব ইস্যূতে আপনাদের বন্ধু, পশ্চিম বাংলার সাহিত্যিক, সাংবাদিকরা কেন এত নীরব (বাংলাদেশে জন্মগ্রহনকারী সুনীল; এবং সমরেশ মজুমদার এর মত হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া)? আপনাদের মমতা দি, কেন মমতাহীন হয়ে যান বাংলাদেশের ব্যাপারে!

বাংলাদেশী বাংগালীঃ বাংগালী জাতির ইতিহাসের সবচেয়ে বড় র্অজন, স্বাধীন সাব্বভৌম বাংলাদেশ। এর আগে হাজার বছর ধরে বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব ছিল, কখনো পাঠান'দের, মোগল'দের, ব্রিটিশ কিংবা পাকিস্তানীদের দ্বারা শাসিত এবং শোষিত; একটি পরাধীন জাতি হিসাবে। বাংলাদেশের বাঙ্গালীরাই হচ্ছে হাজার বছরের ইতিহাসে প্রথম একটি স্বাধীন দেশের অধিবাসী, বাঙ্গালী জাতি। তাই আসাম, ত্রিপুরা বা পশ্চিম বাংলার ভারতীয় বাঙ্গালীদের থেকে আমরা অনেক বেশী স্বতন্ত্র এবং গব্বিত এক স্বাধীন জাতি। আমরা শ্রী নীরদ চৌধুরীর মত, 'পশ্চিম বাংলার' আত্মঘাতি বাঙ্গালী নই। আমরা বাংলাদেশী বাংগালী।

ভবিষ্যত ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাঃ মুক্তিযুদ্ধের সময় সব র্ধমভিত্তিক দল (মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী ইত্যাদি) মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতা করেছিল, তাই এখন প্রায় সব র্ধমভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলিকে, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী বলে সহজেই একঘরে করা সম্ভব হচ্ছে। আজ থেকে কয়েক দশক পরে একাত্তুরের দালাল, রাজাকার এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারী বলে আর কেউ জীবিত থাকবে না। তখন সব র্ধমভিত্তিক দল, এমনকি মৌলবাদীরাও, সাধারন মানুষের সর্মথনের জন্য সম্ভবত মুক্তিযুদ্ধের ও স্বাধীনতার চেতনার কথা বলবে। তখন তাদের কি ভাবে মোকাবিলা করতে হবে তার জন্য এখন থেকেই চিন্তা করা উচিত।

র্বতমানে আমাদের দেশের **দুই** (অথবা তিন) রাষ্ট্রীয় মূলনীতি, **গনতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ,** (এবং র্ধমনিরপেক্ষতা!) এর মধ্যে র্বতমানে **র্ধমনিরপেক্ষতা'ই** হচ্ছে সবচেয়ে **স্পর্শকাতর বিষয় এবং দেশের প্রধান রাজনৈতিক দুই ধারা'র মধ্যে এই র্ধমনিরপেক্ষতা' ইস্যুটি নিয়েই র্পাথক্য এবং সংঘাত সুস্পষ্ট। এই সংঘাত, আগামী অনেক দশকতো বটেই, এমনকি শতক ধরেও চলতে পারে।**

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যারা কথা বলেন বলে দাবী করেন, তাদের জেনে রাখা উচিত যে, মাদ্রাসা'র ছাত্র বা ধর্মপ্রান হলেই যেমন স্বাধীনতা বিরোধী হয় না, ঠিক তেমনি, 'অবন্ধুসূলভ ভারতীয় নীতি'র বিরোধীতা করলেই পাকিস্তানী দালাল হয়ে যায় না। এই ধরনের ঢালাও এবং বাস্তব বিবর্জিত তোতাপাখী'র মত অপপ্রচারের ফলে, মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা সম্পর্কে নতুন প্রজন্মের মধ্যে প্রচন্ড বিভ্রান্তির সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক।

পাদটিকাঃ ৮০'র দশকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বিচিত্রা'র প্রচ্ছদে 'তাজউদ্দীন আহমেদ এর প্রেম' নামে এক র্দূলভ রচনা প্রকাশিত হয়। সেই রচনা থেকে আমরা জানতে পারি, প্রকৃত পক্ষে সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন, হিন্দু থেকে র্ধমান্তরিত হয়ে মুসলমান হন। বিয়ের সময় সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন ছিলেন, এক সন্তান (যে শারিরিক ও মানসিক ভাবে মায়ের উপর র্নিভরশীল), সহ একজন ডিভোর্সি মহিলা আর শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ সাহেব ছিলেন তদানীন্তন সময়ের একজন 'মোস্ট এলিজেবল ব্যাচেলর'। এই তথ্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে, পাঠকের সামনে তুলে ধরা যে, শুধু রাজনৈতিক নয়, ব্যাক্তি জীবনেও শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ, যে কত বড় মাপের একজন মানুষ ছিলেন, তা আমরা অনেকেই হয়ত জানিনা!

তথ্যসূত্রঃ

১। একাত্তুরের গেরিলা, জহিরুল ইসলাম
২। একাত্তুরের দিনগুলি, জাহানারা ইমাম
৩। গেরিলা থেকে সম্মুখ যুদ্ধে, মাহবুব আলম
৪। একাত্তুরের কিশোর মুক্তিযোদ্ধা', মেজর হামিদুল হোসেন তারেক, বীর বিক্রম
৫। জনযুদ্ধের গনযোদ্ধা', মেজর কামরুল ইসলাম ভুইয়া
৬। একাত্তুর স্মরনে, ডা বেলায়েত হুসাইন
৭।একাত্তুরের জীবন যুদ্ধ, শামসুল ইসলাম সাইদ
৮। স্বাধীনতা ৭১, কাদের সিদ্দিকী, বীর উত্তম
৯। যুদ্ধে যুদ্ধে স্বাধীনতা, মেজর নাসির
১০। উইটনেস টু সারেন্ডার; মেজর সিদ্দিক সালিক
১১। সত্য মামলা আগরতলা; কর্নেল শওকত আলী

নাজমুল আহসান শেখ, ২৪ মার্চ সিডনী, victory1971@gmail.com